দৈনিক বাংলা

তারিখ 18 MAR 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

064

স্কুলে ভর্তি বোর্ডের বই

বিজ্ঞান ঃ পড়াতে গিয়ে শিক্ষকরা গলদঘর্ম

॥ দিলীপ দেবনাথ ॥

টেক্সট বুক বোর্ডের নিম্ন-মাধ্যমিক পর্যায়ের বিজ্ঞান বই-গুলোর নাম শিক্ষার্থীরা দিয়েছে 'এসো কেটে পড়ি'। বইয়ে 'এসো নিজে করি' শিরোনামের ছড়াছড়ি থেকেই এ নামের উৎপত্তি। ছাত্র-ছাত্রীরা বিপুল আয়তন ও নতুন ধরনের এসব বই দেখে ভীত, অভিভাবকরা প্রশ্নের উত্তর বের করে দিতে গিয়ে গলদঘর্ম, শিক্ষক-রা পড়াতে গিয়ে হতাশ।

বাস্তবতাবোধের অভাব ঘটলে একটি সৎ প্রচেষ্টা যে কী ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে—বোর্ডের বিজ্ঞান বইগুলো তার দৃষ্টান্ত।

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

তারিখ 13 MAR 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষকরা গলদঘর্ম

(১-এর পৃঃ পর)

বোর্ড দাবী করেছে যে বই-গুলোতে বিষয়বস্তু উপস্থাপনে চিরাচরিত পদ্ধতিতে শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য শেখানোর পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের বাস্তব সমস্যা ও প্রকৃতি সম্পর্কে ঔৎসুক্য ও অনুসন্ধিৎসার ভাব জাগানো ও হাতে কলমে কাজ করার মাধ্যমে তা নিবৃত্ত করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু বোর্ড বা পুস্তক প্রণেতারা ভেবে দেখেননি আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় বর্তমান যে পরিবেশ ও পরিস্থিতি বয়েছে তাতে এই বইগুলো কতটুকু উপযোগী। সেজন্যই বিজ্ঞান বই-গুলো বিভিন্ন মহল থেকে সব-চেয়ে বেশি সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে।

বোর্ডের এসব বিজ্ঞান বইয়ে শতকরা ৬০ ভাগ এসো নিজে করি, ২০ ভাগ পাঠ ও ২০ ভাগ অনুশীলনী। বইগুলোর পৃষ্ঠা সংখ্যা ও আকারও বড়ো। ক্রাউন সাইজে ছাপা এসব বই।

বিজ্ঞান বইগুলো নিয়ে বিভিন্ন মহলের অভিযোগ, এতে প্রতিটি বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্তভাবে বোঝা-নোর পরিবর্তে বেশ দীর্ঘ করে লেখা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীরা পড়তে উৎসাহ পায় না।

শতকরা ৬০ ভাগ 'এসো নিজে করি' রয়েছে বলে ছাত্রছাত্রীরা বা শিক্ষকরা ধরেই নিয়েছে এগুলো নিজে করতে হবে। তাই এ অংশ-গুলো গভীর মনোযোগ সহকারে তারা পড়তে চায় না। শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ের অভিযোগ ক্লাসে বা বাড়িতে তাদের এমন পরিবেশ বা সুযোগ নেই যে এগুলো করা যেতে পারে অথবা এগুলো করার জন্যে তাদের প্রয়ো-জনীয় সময় নেই। স্কুলে বা বাড়িতে এগুলো করতে গেলে দরকার ছোটখাট একটি ল্যাব-রেটরী।

মাইক্রোস্কোপ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের প্রায় ৭০ রকমের বস্তু, ২৫/৩০ রকমের রাসায়নিক দ্রব্য ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র ছাত্রছাত্রীদের দরকার, এসব 'এসো নিজে করি' সম্পন্ন করতে। কিন্তু বোর্ড বোধ হয় জানে না, নবম-দশম শ্রেণীতেই যেখানে দেশের অধি-কাংশ স্কুলে সুযোগ-সুবিধার অভাবে প্র্যাকটিক্যাল নাম মাত্র করানো হয় সেখানে নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ে এগুলো করানো প্রায় অসম্ভব। বাস্তবেও তাই ঘটছে। 'এসো নিজে করি'র ওপর স্কুলে কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না। ফলে ছেলেমেয়েরা শিখতেও পারে না। আর বাড়িতে শিক্ষার্থীদের এ-গুলো করতে হলে যে আর্থিক সঙ্গতি ও সুযোগের দরকার তা দেশের কজন ছাত্রছাত্রীর আছে?

বইগুলো সম্পর্কে আরো একটি অভিযোগ, এতে অধ্যায় শেষে যেসব প্রশ্ন বা অনুশীলনী দেয়া আছে সেগুলো পরীক্ষার প্রশ্ন হিসাবে আসে না। আর বিজ্ঞানের শিক্ষকরা পরীক্ষার জন্যে যেসব প্রশ্ন করেন সেগু-লোর উত্তর বইয়ে খুঁজে পায় না শিক্ষার্থীরা। তাই তারা প্রশ্নের উত্তর লিখতে বা শিখতে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে অভিভাবক অথবা প্রাইভেট টিউটরের কাছে।

বেশ কয়েকটি স্কুলে খোঁজ নিয়ে দেখেছি, শিক্ষার্থীরা এই বইকে মনে করে একটি মূর্তিমান বিভীষিকা। এসো নিজে করি'র জ্বালায় অস্থির হয়ে তারা বই-গুলোর নামই দিয়েছে 'এসো কেটে পড়ি।' অর্থাৎ এ বই তারা পড়তে চায় না।

অনেক স্কুলের ছেলেমেয়ে বলেছে, পরীক্ষার আগে শিক্ষক তাদের প্রশ্ন দিয়ে দেন। প্রশ্ন-গুলোর উত্তর শেখার ও পরীক্ষার হলে লেখার দায়িত্ব শিক্ষার্থী-দের।

বেশ কয়েকজন শিক্ষক জানি-য়েছেন যে বইগুলো এতো ফেনিয়ে লেখা যে পড়তে গেলে ছাত্র-শিক্ষকের উভয়ের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। পাঠ্য বইয়ের চেয়ে এগু-লোকে পাঠ্য নির্দেশিকা বলেই বেশি মনে হয়। একজন শিক্ষকের অভিযোগঃ সপ্তম শ্রেণীর জন্যে বা অষ্টম শ্রেণীর জন্যে ক্রাউন সাইজে ছাপা দুশো পৃষ্ঠারও বড়ো বই পাঠদানের জন্যে রীতি-মত ভারী।

বিষয়বস্তুকে আরো সংক্ষিপ্ত ও 'এসো নিজে করি' অধ্যায়-গুলো না কমানো হলে বর্তমান পরিস্থিতিতে এগুলো স্কুলে পড়ানো সম্ভব নয়।

শিক্ষকদের আরো প্রশ্নঃ প্রাই-মারী বা মাধ্যমিক পর্যায়ের বিজ্ঞান বইয়ে যেখানে নতুন এই পাঠদান পদ্ধতি বা বই চালু করা হয়নি সেখানে হঠাৎ নিম্নমাধ্যমিক পর্যা-য়ের বইগুলোতে প্রায় ৬০ ভাগ হাতে কলমে করার নির্দেশ দেবার মানে কী? আসলেই কি সেগুলো করার সুযোগ আমাদের দেশের স্কুলগুলোতে আছে? তারা আরো বলেছেন, বোর্ডের এসব বই দেখে মনে হয়, তিন বছরের মধ্যে ছেলেমেয়েদের তাবৎ বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান দিয়ে তাদের সব-জান্তা করে দেবার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। অথচ খেয়াল করা হয়নি আদৌ শিক্ষার্থীরা এগুলো পড়তে বা শিখতে পারবে কিনা।

অভিভাবক মহলও এসব বিজ্ঞান বই নিয়ে বিব্রত। ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর তারা এসব বই দেখে বলে দিতে বা লিখে দিতে পারছেন না। ফলে তাদের অন্য বই হাতড়তে হচ্ছে। অথবা ছেলেমেয়েদের বলতে হচ্ছে নোট বই (বেআইনী) ও গৃহশিক্ষকের সাহায্য নেবার জন্যে।

অর্থাৎ বইগুলো যতো সাধু উদ্দেশ্য নিয়েই লেখা হোক না কেন তা উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। অনেকে বলেছেন, বই-গুলো বিদেশী বইয়ের ভাষান্ত-রাদও আমাদের মতো দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যে অনুপযোগী। এ-গুলোর ব্যাপক পরিবর্তন দরকার।

তারা আরো বলেছেন, অষ্টম শ্রেণীর ৫ম অধ্যায়ের 'এসো নিজে করি' অংশগুলো বিশেষ করে দ্রবণ মিশ্রণের পর কি বিক্রিয়া হয় তা লেখা বা ষষ্ঠ শ্রেণীর ১২শ অধ্যায়ের এসো নিজে করির সপ্তমটি অথবা সপ্তম শ্রেণীর এসো নিজে করি ১১.১২ ধরনের অংশগুলো সংশ্লিষ্ট ক্লাসের শিক্ষার্থীদের জন্যে অনুপযোগী।

এছাড়া অষ্টম শ্রেণীর জন-সংখ্যা ও পরিবেশ অধ্যায়ে এমন কিছু অনুচ্ছেদ রয়েছে যেগুলো শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করতে পারে। মোটকথা বইগুলো আরো সংক্ষিপ্ত, 'এসো নিজে করি' কমিয়ে আনা, অধ্যায় শেষে প্রচ-লিত ধরনের প্রশ্ন সংযোজন অতি কথন বর্জন না করলে শিক্ষার্থী-দের কাছে এগুলো বিভীষিকা হয়েই থাকবে।

ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর বই দুটির রচয়িতা তপন চক্রবর্তী, শাজাহান তপন, ইকবাল আজিজ মুস্তাকী ও সত্যব্রত রায়। সপ্তম শ্রেণীর বইটি রচনা করেছেন ডঃ দেওয়ান সিরাজুল ইসলাম, আবুল হাসান, মিসেস সালেহা খাতুন ও মোঃ মোসলেম।

বইগুলোর সম্পাদনা করেছেন (৬ষ্ঠ শ্রেণী) ডঃ আহমেদ শাম-সুল আলম, ডঃ কে এম সিরা-জুল ইসলাম, এম এ জব্বার (৭ম শ্রেণী) ডঃ মোঃ ইব্রাহিম, এম এ জব্বার, ডঃ এ কে এম ওবায়-দুল্লাহ ডঃ হাবিবুর রহমান (৮ম শ্রেণী) এম এ জব্বার, ডঃ মোঃ ইব্রাহিম, ডঃ হাবিবুর রহমান ও ডঃ আনোয়ারুল হক। তিনটি বইয়েরই উপদেষ্টা জন ই রীভস।